Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 231–239
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

গণনাট্যের তিন কাণ্ডারীর অন্তর্বিক্ষণে সমাজ

সংহিতা ব্যানার্জি
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়
ইমেল : banerjeesanghita2013@gmail.com

Keyword
Femine, partition, refugee problem, 1940s, capitalism, labor movement, Feudalism, Gananatya, Bijan Bhattacharya, Tulsi Lahiri, Digindrachandra Bandyopadhyay.

Abstract
Bijan Bhattacharya, Tulsi Lahiri and Digindrachandra Bandyopadhyay, the legendary personalities of Bengali theatre literatute and the spearhead of the Gananatya movement, opened a new horizons for Bengali drama. The subjects of those work is a various accounts of the turbulent, tumultuous, domestic and international situation of the turbulent forties. The terrible Great Depression of the 1950s, the hellish situation of Bengal, the starvation of millions of people and the death of epidemics by eating inedible food in the effort to extinguish the fire of stomach, the sale of daughters by fathers for the sake of honor, the sale of wives by husbands and even the scandalous history of women's self-sale are objectively and poignantly described in their literature. Along with this, the communal riots of 1946, the migration of a large number of scattered people as an inevitable result of the partition, the crisis of existence in foreign countries despite being dominated by the native people, and the struggle for survival are noticeable in their plays. Besides, the final economic crisis of the British-ruled and newly independent India, the exploitation of workers in factories as the evils of capitalist civilization, deprivation, retrenchments of workers, accumulated labor discontent centered on lockouts, strikes, organized labor movements as well as exploitation by landlords and tenants as part of feudal society, peasant deprivation, misc. Deprivation of their land by diplomatic conspiracies and peasant uprisings in protest, Tevaga movement, brilliant chapter of resistance movement for the right of sharecropping has been embodied with deep social analysis in the works of the discussed trio of dramatists. As a matter of fact, Gananatya's leading personalities, being initiated into Marxist

ideals, not only contributed to the end of their literature through exploitation, deprivation and despair, but also sought the direction of liberation of the nation through collective protest and resistance movement. In view of the origin and development of Gananatya, the analysis of the mentioned topics in terms of comparative discussion of prominent and significant dramas of Bijan Bhattacharya, Tulsi Lahiri and Digindrachandra Bandyopadhyay is carried out in the present purpose or article I have tried to reveal this fact in view of the discussion of the creations of these trio Gananatyakar.

Discussion

বাংলা নাট্য সাহিত্যের তিনকাণ্ডারী বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র। উত্তাল চল্লিশের দশকের সময়পর্বে এই তিন প্রথিত যশা নাট্যকার সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অবক্ষয়িত মানবাত্মার মুক্তির পথ অন্বেষণ এবং জীবনের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। সংঘাতমুখর জীবনপরিস্থিতিতে শ্রমজীবী সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বাঙ্ময় প্রকাশে এই তিন নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ তাই জীবন্ত ও বস্তুনিষ্ঠরূপেই প্রতিভাত।গণনাট্য আন্দোলনের এই তিন নাট্যকারের নাট্য সমূহের তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে বিষয়টির যথাযথ স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছি। গণনাট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়–

> "শিক্ষাপ্রদ আমোদপ্রমোদ গণজীবনে জ্ঞানস্পৃহা জাগায় এবং নিজ জীবন সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এই আত্মচেতনার উদ্রেকই লোকশিক্ষার মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার অন্যতম প্রধান বাহন গণনাট্য।"[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বড় অংশ যেমন-কথকতা, কবিগান, ময়মনসিংহ গীতিকা, অপেরা, গম্ভীরা, বাউল লোকশিক্ষার মাধ্যম রূপে কিয়দংশে গণনাট্যের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। গণনাট্যের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা চলে-

১. গণনাট্য শিক্ষামূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
২. গণনাট্য সর্বহারা মানুষের নাটক।
৩. গণনাট্য বাস্তবজীবনের সমস্যার উদ্ঘাটন করে।
৪. গণনাট্য বিশেষ কোনো শিল্পীর প্রাধান্যকে স্বীকার করে না।
৫. গণনাট্যে গণসঙ্গীতের স্থানই প্রধান।

যদিও চীনদেশের কিয়াংসী প্রদেশে ১৯৩১ সালে চীনা সোভিয়েট নাট্যসঙ্ঘ কর্তৃক গণনাট্যের সূচনা হয়, তবুও ঘুইচীনের বিখ্যাত গোর্কি বিদ্যালয়ের প্রায় হাজার খানেক ছাত্রের গণনাট্যের প্রচেষ্টা উপেক্ষণীয় নয়। ভারতে প্রধানত চল্লিশের দশকে গণনাট্যের সূচনা হয়। ১৯৪১ সালে Anil D' Silva– উদ্যোগে Indian People's Theatre Association এর প্রথম ইউনিট ব্যাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার একটি সাংস্কৃতিক শাখা ১৯৪৩ এ কলকাতার প্রতিষ্ঠিত হয়। 'গণ' অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-আকাঙ্খার রূপায়ণকল্পে এই গণনাট্য সঙ্ঘ বঞ্চিত,নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণির সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের পথে মুক্তির দিশার সন্ধান দিয়েছেন।অবিচার,শোষণ,বঞ্চনা,কালোবাজারি ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি চল্লিশের দশকের জাতীয় বিপর্যয়স্বরূপ দুর্ভিক্ষ,মহামারী,মানুষের জীবন ও জীবিকার যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের পরিণামস্বরূপ ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও উত্তরণের বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য এই গণনাট্য।

গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই জুলাই বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ও সুবর্ণপ্রভার জ্যেষ্ঠ সন্তান বিজন ভট্টাচার্য নাট্যচর্চার পারিবারিক আবহেই নাট্য অনুরাগী হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পঞ্চদশ বছর বয়সেই মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। জীবনের পরবর্তী অধ্যায় সাংসারিক স্বচ্ছলতা আনয়নের প্রচেষ্টায় আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করলেও একদিকে সাহিত্যপ্রীতি ও অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি দুর্বলতাবশত

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের যোগদান করেন। ১৯৪৩ এ অরণি পত্রিকায় 'আগুন' নাটকের প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর নাট্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ ও ১৯৪৪ এ 'নবান্ন' এবং 'জবানবন্দি', ১৯৪৬-৪৭ -এ 'অবরোধ', 'মরাচাঁদ', 'জীয়নকন্যা', ১৯৫০ এ 'কলঙ্ক', 'দেবীগর্জন', 'ছায়াপথ', 'গোত্রান্তর', 'জতুগহ', 'ধর্মগোলা', 'মাস্টারমশাই' নাটকের মাধ্যমে তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরূঢ় হন। হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, '৪৩' এর মহামন্বন্তর, কমিউনিস্ট আন্দোলন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়সম্পৃক্ত অগণিত নাটক বাংলা নাট্যসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অন্যদিকে গণনাট্য–নবনাট্য আন্দোলনের অপর এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব তুলসী লাহিড়ী ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে অখণ্ড বাংলার রংপুরের সাদুল্লাপুরের নলডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি.এ. এবং এল. এল. বি. উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে রংপুরে ও পরবর্তীকালে কলকাতায় আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। যদিও সঙ্গীতের প্রতি আনুগত্যবশত তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে পদত্যাগ করে 'মেগাফোন' কোম্পানী ও 'His Master's Voice' এ সঙ্গীত পরিচালক রূপে যোগদান করেন। পাশাপাশি চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতেও আত্মোনিয়োজিত করেন। তাঁর সৃষ্ট অগণিত নাটকের মধ্যে 'মায়ের দাবি' (১৯৪১), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০), 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭), 'পথিক' (১৯৫১), 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯) উল্লেখযোগ্য। বস্তুত চল্লিশের দশকের উত্তাল সময়পর্বে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মহার্ঘতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিপ্রয়াণ, এমনকি স্বাধীনোত্তর দেশের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট মানুষের নৈতিকতা, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটায়।নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী এই কীটদষ্ট সমাজ অবলোকনে গভীরভাবে ব্যথিত হন এবং পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারা শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অগণিত নাটকে ব্যক্ত করেন।

পাশাপাশি নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৫-ই জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত আদাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।মাতৃগর্ভে পিতৃহীন নাট্যকার ছাত্রাবস্থাতেই গান্ধীবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইন-অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিচারে কারাবরণ করেন। কারাবাস অন্তে সাংবাদিকতার বৃত্তির পাশাপাশি অগণিত নাটক রচনার মাধ্যমে স্বকীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটান। সৎ, নির্ভীক, স্পষ্টভাষী, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী এই নাট্যকার চল্লিশ থেকে আশির দশকের উত্তাল, অরাজক সময়পর্বকে তাঁর নাট্যসাহিত্যে বিধৃত করেছেন।তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে 'অন্তরাল' (১৯৪১), 'দীপশিখা' (১৯৪৩), 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'মশাল' (১৯৫০), 'জীবনস্রোত' (১৯৬০), 'দুরন্তপদ্মা' (১৯৭১) অন্যতম।দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের উত্তাল, অস্থির, সংঘাতময় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জীবন্তরূপে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর নাট্যসাহিত্যে।

সমসাময়িক এই তিন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অরাজক এক যুগপরিস্থিতির সাক্ষীস্বরূপ শুধুমাত্র জাতির বঞ্চনার ইতিহাস নয়, জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের ইঙ্গিতদানের মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বল নবযুগের আহ্বানবাণীও ঘোষণা করেছেন।

বস্তুত আলোচ্য তিন নাট্যকারের রচনাতেই যে বিষয়টির সানুপুঙ্খ ও বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে তা হল '৪৩' এর ভয়াবহ মহামন্বন্তর।মন্বন্তর প্রসঙ্গে বলা যায়—

> "প্রাকৃতিক অথবা মানবিক কারণে সংঘটিত খাদ্যশস্যের অত্যন্ত অভাবের ফলে ব্যাপক অন্নকষ্ট সৃষ্টি হয়। সাধারণত বহুস্থলে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিলে তবেই অবস্থাটিকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়।"[২]

পাশাপাশি মন্বন্তর' বা 'Famine' শব্দের ব্যাখ্যায় 'এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় বলা হয়েছে,

> "An extreme and protracted shortage of food. Usually resulting in higher than normal death rates."[৩]

কিংবা,

> "True Famine is shortage of total food so extreme and protracted as to result in widespread persisting hunger, notable emaciation in many of the affected population and a considerable elevation of community death rate attributable at least in part of deaths from starvation."[৪]

অর্থাৎ, দীর্ঘস্থায়ী খাদ্যাভাব যখন বহু মানুষের অনশন ও মৃত্যুর কারণ হয়,তখন দুর্ভিক্ষ ঘটে। মন্বন্তর প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট- দুটি কারণেই সংঘটিত হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণ যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কীটের উপদ্রব হতে পারে, তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট কারণস্বরূপ যুদ্ধ, সরকার কর্তৃক শস্য বাজেয়াপ্তকরণ, শস্য মজুতদারী ইত্যাদি হতে পারে। বস্তুত পঞ্চাশের মন্বন্তরের নেপথ্যে প্রাকৃতিক কারণ অপেক্ষা মনুষ্যসৃষ্ট কারণই অধিকতর ক্রিয়াশীল ছিল।বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, জাপান কর্তৃক ভারতের চাল আমদানির উৎস বার্মা অধিগ্রহণ, জাপানী আক্রমণ প্রতিহতকরণে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পোড়ামাটির নীতিগ্রহণ, সৈন্যদের জন্য খাদ্যশস্য মজুতকরণ, মুনাফালোভী কর্তৃক কালোবাজারি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মহার্ঘতা– বাংলায় চরম দুর্ভিক্ষের সূচনা করে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি শহরাঞ্চলের তুলনায় অনেকাংশেই অবনতি ঘটে।একদা সম্পন্ন গৃহস্থ কৃষক পরিবারগণ খাদ্যের প্রত্যাশায় মহানগরীর রাজপথে ভিক্ষুকে পরিণত হয়। কিন্তু ভিক্ষার অভাব, অনাহার মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবনমন ঘটায়। সন্তান বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, কন্যা বিক্রয় এমনকি জঠরজ্বালায় নারীর আত্মবিক্রয় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

"দারিদ্রের জ্বালায় পূর্ববঙ্গে অসংখ্য নারীর 'বেশ্যাবৃত্তি' অবলম্বন। বহু অভিভাবক কর্তৃক পুত্র-কন্যা বিক্রয়।"[৫]

বিজন ভট্টাচার্য 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটক-ত্রয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। পঞ্চম দৃশ্যের অবতারণায় 'আগুন' নাটকে নাট্যকার বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পারিবারিক চিত্রের অঙ্কণে সমাজের বিবিধ অবস্থানে রত মানুষের দুর্দশার কাহিনির বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। অন্নহীন বুভুক্ষু পরিবারগুলি দ'মুঠো অন্নের প্রত্যাশায় প্রত্যহ প্রত্যুষেই খাদ্যের সারিতে অপেক্ষমান থাকে। দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকলেও প্রত্যহ চাল মেলে না। ব্যর্থ মনোরথ হয়েই ফিরে আসতে হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল হতভাগ্য মানুষের জীবনই আজ একসূত্রে গ্রথিত। নেত্য, নেত্যর পিতা-মাতা, সতীশ, সতীশপত্নী ক্ষীরি, মেয়ে ফুলকী, হরেকৃষ্ণ, মনোরমা প্রত্যেকেই সরকারী অন্নসাহায্যের আশায় কালতিক্রম করে। 'আগুন' তথা এই বুভুক্ষু মানুষগুলির জঠরাগ্নিকেই নাটয়কার ইঙ্গিত করেছেন। প্রয়োজনের নিরিখে সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতা, পুঁজিবাদী, মুনাফালোভী কর্তৃক খাদ্যদ্রব্যের মজুতকরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের মহার্ঘতা তৎকালীন বাংলাকে চরম দুর্দিনের সম্মুখিন করে। এই সত্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপায়িত হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' নাটকে।

মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী নাটক 'জবানবন্দী' (১৯৪৩) চারটি দৃশ্যের সমন্বয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে একদা অবস্থাপন্ন, অসহায়, হতভাগ্য, খাদ্যের প্রত্যাশায় গ্রাম থেকে শহরে আগত এক কৃষক পরিবারের শোচনীয় দুর্দশার কাহিনি। অভাব মানুষের ভদ্রতা, আব্রুতার মুখোশ, পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করে মানুষের জান্তব রূপকেই প্রতিফলিত করে, আলোচ্য নাটকে তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি প্রতিফলিত। বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল খাদ্যাভাবে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূর কাতরোক্তি, অনাহারে মৃত সন্তানের জন্য প্রতিবেশিনীর আকুল ক্রন্দন, খাদ্যের প্রত্যাশায় গ্রামবাসীর শহরের উদ্দেশে যাত্রা ইত্যাদি দর্শনে সপরিবারে শহরযাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্পন্ন চাষী মহামন্বন্তরের কবলে পড়ে কলকাতা মহানগরীর রাজপথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়। সেইসঙ্গে বহু প্রতীক্ষায় লব্ধ অন্ন স্বামী এমনকি অনাহারক্লিষ্ঠ শিশু পৌত্রকে না দিয়ে পরাণের স্ত্রীর একাকী ভক্ষণের ঘটনা এক বিশেষ সময়পর্বের নারকীয়তার সাক্ষ্য দেয়। পরাণ মণ্ডলের প্রেতিনী দ্রষ্টা স্ত্রীর এহেন আচরণ প্রমাণ করে অভাবের যাতনা, জঠরাগ্নির জ্বালা সেইসময় মানুষের পারিবারিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বহীনতার অন্তিম ধাপে অবনত করে। সেই সঙ্গে খাদ্যাভাবে একমাত্র শিশুপুত্র মানিকের মৃত্যুতে সাময়িকভাবে বিচলিত হলেও বেন্দার স্ত্রীর আপন ক্ষুণ্নিবৃত্তি চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে শহুরে যুবকের নিকট আত্মবিক্রয়ের ঘটনা বাস্তবসম্মত-ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। পৌত্রের মৃত্যু, খাদ্যের জন্য পুত্রবধূর সম্মানবিক্রয়ের ঘটনায় বিকারগ্রস্থ পরাণ মণ্ডল দিনবদলের স্বপ্ন দেখে। মাঠ ভর্তি সোনার ফসল, গোলা ভর্তি ধানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মহানগরীর ফুটপাতে এক অসহায় বৃদ্ধের সর্বশূন্যতায় আত্মনিমজ্জন– পঞ্চাশের মন্বন্তরের এই জাতীয় দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের বাঙ্ময় রূপ বিজন ভাট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক।

'৪৩' এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের চতুর্থ অঙ্ক সম্বলিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন' (১৯৪৪) দুর্ভিক্ষ এবং তার আনুষঙ্গিক অঙ্গস্বরূপ মহামারীর এক বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য। আলোচ্য নাটকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের নেপথ্যে এক শ্রেণির মানুষের অর্থলিপ্সা, কালোবাজারি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কৃত্রিম অভাব সৃজনের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যকে গুদামজাতকরণ

সেইসঙ্গে শহুরে বিত্তশীল মানুষের চূড়ান্ত স্বার্থপরতা মানুষকে কি অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখিন করেছিল, তারই সানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে।আলোচ্য নাট্যরচনা প্রসঙ্গে নাট্যকারের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-

> "ঘরে সেদিন অন্ন ছিল না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি নবান্ন লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে। এই নাটকের প্রথম ও চতুর্থ অংকের সমস্ত দৃশ্য আমিনপুর গ্রামে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকের সমস্ত দৃশ্য শহর কলকাতায় শুধু দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য গ্রামের সংগঠিত হয়েছে। নাটকে কৃষক সমাজের চালচিত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদেশি শাসনের অত্যাচার দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের স্বার্থান্বেষী চক্রের মুনাফাবাজি কালোবাজারি জনিত আমিনপুরের কৃষকদের দুরাবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে সেই দুর্দশা থেকে মুক্তির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নাটকে। নবান্ন তাই একাধারে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক— এই নাটকের শুধু অত্যাচার আর শোষণের চিত্র অঙ্কিত হয়নি, জোটবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে যে নবজীবনের সম্ভাবনা সূচিত হয় তার ইঙ্গিত নবান্ন নাটকের ধ্বনিত হয়েছে।"[৬]

'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দার ও তার পরিবারের পঞ্চাশের মন্বন্তরের করালগ্রাসে অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র প্রতিস্থাপিত হয়েছে। খাদ্যাভাবে দুই পুত্র ও একমাত্র পৌত্র মাখনের মৃত্যু, দুর্বৃত্তদের আক্রমণ থেকে গ্রামের মেয়েদের রক্ষার্থে স্ত্রী পঞ্চাননীর মৃত্যুতে শহরে আগমন, কিন্তু শহরের বিত্তবান মানুষের বিবেকহীন স্বার্থপরতায় পুত্র কুঞ্জ ও পুত্রবধূ রাধিকার অবর্ণনীয় দুর্দশা, অসাধু নারী ব্যবসায়ী কর্তৃক কনিষ্ঠা পুত্রবধূর অপহরণ- প্রধান সমাদ্দারের শহরের নিষ্ঠুর বাস্তবতার স্বরূপ দর্শনে পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন, ধর্মগোলা স্থাপনের স্বপ্নের মাধ্যমে নাটকের ইতিবাচক পরিণতিদানে সচেষ্ট হয়েছেন নাট্যকার।বস্তুত 'দুর্দশা ও প্রতিরোধের নাটক' 'নবান্ন'–এ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য শুধুমাত্র মন্বন্তরক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্রায়ণ নয়, সংকট থেকে উত্তরণের দিশারও সন্ধান দিয়েছেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় গণনাট্য আন্দোলনের অপর উল্লেখযোগ্য নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী রচনা করেন 'ছেঁড়া তার', 'দুঃখীর ইমান'। একদা কর্মসুত্রে রংপুর বাসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক 'ছেঁড়া তার'। '৪৩' এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে রংপুরের এক কৃষক পরিবারের শোচনীয় দুর্দশার ইতিবৃত্ত আলোচ্য নাটকটি।তিন অঙ্কের এই নাটকে মন্বন্তরের করালগ্রাসে এক সুখী দম্পতির জীবনের তার ছিন্ন হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনি ধ্বনিত হয়েছে। একদা দরিদ্র পিতার সন্তান হওয়ায় মেধাবী ছাত্র হয়েও শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজ পরিশ্রমে ও চেষ্টায় চাষবাসের সাহায্যে অর্থ উপার্জন করে পিতৃঋণ পরিশোধ, ফুলজানকে সাদি, বছিরের জন্ম ও বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত জীবনের গতি স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হলেও মন্বন্তর ও মহামারী তাকে এক কঠিন সংকটের সম্মুখিন করে। অনাহারে জর্জরিত পুত্রের খাদ্যের আকাঙ্খায় আকুল ক্রন্দন, স্ত্রীর অসহায়তাকে বহুগুণিত করে যখন হাকিমুদ্দির চক্রান্তে সরকারী লঙ্গরখানায় আহার্য প্রাপ্তির শেষ আশাটুকু অবলুপ্ত হয়। আকালের দিনে স্ত্রীর ভরণপোষণের অক্ষমতার যন্ত্রণাকে বহুগুণিত করে যখন তার পরিচয় আকালের দিনে স্ত্রীর খাদ্যপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর অন্নসংস্থানকে সুনিশ্চিত করতে বাধ্য হয়ে স্ত্রী ফুলজানকে বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি দেয় তালাক প্রদানের মাধ্যমে। সেইসঙ্গে পুত্র বছিরকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্য ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় শহরের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। কিন্তু কালক্ষেপে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, স্ত্রী ফুলজানের সংস্কার তার দাম্পত্য জীবনকে চিরতরে অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করে। 'আকালের দুইটা মাস' অতিক্রম হলেও রহিমুদ্দির জীবনের কিছুই আর পূর্বাবস্থায় ফেরে না। জীবনের যে তার একবার ছিন্ন হয়ে গেছে, তাকে পুনরায় জোড়া লাগানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার অন্তে তাই আত্মহননের মধ্যে দিয়েই রহিমুদ্দি মুক্তির পথ অন্বেষণ করে। বস্তুতপক্ষে আকালের দিনে ফ্যাসীবাদী চক্রান্ত কিভাবে দরিদ্র, অসহায় মানুষের শেষ আশাটুকুকেও নির্বাপিত করেছিল তারই বাস্তব ও মর্মভেদী আলেখ্য তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকটি।

পঞ্চাশের মহামন্বন্তরেরর প্রেক্ষাপটে তুলসী লাহিড়ীর অপর উল্লেখযোগ্য নাটক 'দুঃখীর ইমান' রচনা প্রসঙ্গে নাট্যকারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-

> "গণতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে চির বঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যারা ধনলোভীর যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতে এই নাটকের সৃষ্টি।"[৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু নীতি যেমন পোড়ামাটির নীতি, সেচ ব্যবস্থা বন্ধ, চিরস্থায়ী ব্যবস্থার বিলোপ এদেশের মানুষকে সীমাহীন খাদ্যসংকটের সম্মুখীন করে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যুতে বাংলা কার্যত শ্মশ্মানভূমিতে পরিণত হয়। সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষই একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের পাশাপাশি জাতিকে আসন্ন অবলুপ্তি তথা জাতীয় বিপর্যয় থেকে উদ্ধারকল্পে মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয় আলোচ্য নাটকে।বস্তুত অভাব মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করে। ধর্মদাস ও বিলাতির প্রেমের ইতিবাচক পরিণতি এই মন্তব্যের সত্যতাকেই নির্দেশ করে।বস্তুত মন্বন্তরের করাল গ্রাসে বলিপ্রদত্ত অসহায় মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটকটিতে।

বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিজন ভট্টাচার্য এবং তুলসী লাহিড়ীর ন্যায় তাঁর সৃষ্টিকর্মে মন্বন্তর পীড়িত বাংলার অপরিমেয় দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর মন্বন্তর আশ্রয়ী নাটক 'দীপশিখা' গ্রামবাংলার অগণিত বুভুক্ষু মানুষের খাদ্যের প্রত্যাশায় কলকাতা মহানগরীর রাজপথে ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার করুণ ইতিবৃত্ত। আলোচ্য নাটকে একদা সম্পন্ন গৃহস্থ গ্রাম্যবধূর নিরন্ন সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার প্রত্যাশায় গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে কলকাতার রাজপথে ভিখারিণীতে পর্যবসিত হওয়ার যন্ত্রণাময় ইতিহাস আলোচ্য নাটকের ভিত্তিভূমি। শহরে ভিক্ষার অপ্রতুলতা, খাদ্যের অভাবে পুত্রের মৃত্যু, অভিমানী কন্যার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া– উপর্যুপরি দুই ঘটনায় মানসিক বিকারগ্রস্থা রূপে সরকারী হ্সপাতালে স্থানপ্রাপ্তি, কখনও বিকারের ঘোরে জঠরাগ্নি নির্বাপনের নিমিত্ত খাদ্যের জন্য আর্তি, কখনও খাদ্যহীনতার কারণে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা থেকে সেই প্রত্যাশিত খাদ্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান- নারীসত্তা ও জননীসত্তার দোলাচলতায় জননীসত্তার জয়লাভ এবং পরিণতিতে হারানো কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্তিতে নাট্যকাহিনির ইতিবাচক পরিণতি নাটকটিকে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র দান করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাট্যকার ভিখারিণী চরিত্রটি কোনো নামকরণ করেননি। বাস্তবিক যে, তৎকালীন কঠিন পরিস্থিতিতে সকল অভাবী মাতার শ্রেণিপ্রতিনিধি হিসাবে চরিত্রটি নাটকে আপন স্থান করে নিয়েছে। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য 'দীপশিখা' নাটকে শুধুমাত্র অভাবী মানুষের যন্ত্রণার কাহিনিই লিপিবদ্ধ করেননি, মন্বন্তর পীড়িত মানুষদের উদ্ধারকল্পে মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মোদ্যোগের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। বস্তুত মন্বন্তর প্রতিরোধকল্পে নারী সুরক্ষা সমিতি, মহিলা সমিতির কর্মপ্রচেষ্টা, মহিলা নেত্রী রাণু মুখার্জি এবং নাট্যকার পত্নী সবিতা রাণী দেবীর উদ্যোগ উল্লেখ্য নাট্যকাহিনি রচনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। বস্তুত গণনাট্যপন্থী এই নাট্যকার হতাশার অন্ধকারে কাহিনির যবনিকা পতন ঘটাননি, স্বপ্ন ও প্রতিরোধের মাধ্যমে কাহিনির ইতিবাচক পরিণতি দান করেছেন।

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত প্রাক-স্বাধীনতা ও সদ্য স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি এই ত্রয়ী নাট্যকারের লেখনীতে বাঙ্ময় হয়ে আছে।লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ তাদের পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে জীবন ও পরিবারের নারীদের সম্মান রক্ষার্থে স্বজাতি অধ্যুষিত দেশে উদ্বাস্তুশিবিরে নারকীয় জীবনযাপনে বাধ্য হয়। একদিকে সর্বস্ব হারিয়ে পরদেশে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, অন্যদিকে এদেশের স্থায়ী কৃষকদের সঙ্গে জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে সংঘাত- পশ্চিমবাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বসতবাটি বাগুইআটির 'বাস্তুভিটা'র নিকটস্থ বাগজোলা খালের ধারে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত ছিন্নমূল মানুষের শিবিরজীবনের নারকীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম, বেআব্রু পরিস্থিতিতে পরিবারের নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার ব্যর্থতা, এদেশের স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে জমির দখলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিবাদ একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষের ষড়যন্ত্রে দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহণ, উদ্বাস্তু মানুষদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সরকারী খাল কাটার কাজে নিয়োগ ইত্যাদি ইতিহাসসম্মত বাস্তবনিষ্ঠ তথ্যের রূপায়ণ করেছেন তাঁর 'নয়াশিবির' নাটকে। উদ্বাস্তু মানুষের জীবনযন্ত্রণার পাশাপাশি নাট্যকার আলোচ্য নাটকে যে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন, তা হলো শিবিরবাসিনী উদ্বাস্তু কন্যার সঙ্গে এদেশীয় কৃষক যুবকের প্রণয়-যা সমাজস্বীকৃত নয়। দুই ভিন্ন সামাজিক অবস্থানেস্থিত নারী-পুরুষের প্রণয় সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুই শ্রেণির মানুষের বিবাদ সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। স্বজাতিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার বীভৎসতা এড়াতে পিতা, অগ্রজ এবং অন্যান্য শিবিরবাসীর সঙ্গে উদ্বাস্তু কন্যা বাসনার আন্দামানে যাত্রার সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং অন্তিমে প্রেমিক রাখালের সঙ্গে নয়াশিবির গঠনের স্বপ্ন দিয়ে

কাহিনির ইতিবাচক পরিনতি ঘটেছে। বস্তুত নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য নাটকে সদ্য স্বাধীনোত্তর দেশের এক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি— দুই ভিন্ন দেশের, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মেলবন্ধন, সম্পর্ক স্থাপনের ইতিবৃত্ত সুনিপুণভাবে, উপস্থাপিত করেছেন, যা তৎকালীন সমাজ-ইতিহাসের দলিলস্বরূপ।

একই ভাবে গণনাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'গোত্রান্তর' নাটকে উদ্বাস্তু মানুষের স্বজাতি অধ্যুষিত পরদেশে অস্তিত্ব রক্ষার্থে জীবনসংগ্রাম, মানুষের টিকে থাকার লড়াই, গোত্রান্তরের কাহিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। গোত্রান্তর নাটক রচনাপ্রসঙ্গে নাট্যকার স্বয়ং জানিয়েছেন-

> "নীতিবাদের প্রশ্ন নয় - জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রান্তর আজ যুগসত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা মতই সমুজ্জ্বল নাটকের তার অপলাপ করা কোনো নাট্যকারের জীবন ধর্ম হতে পারে না। নাটকের মধ্যে এই গোত্রান্তর কিভাবে ঘটিলো তাহা আলোচনা করতে গেলে বলিতে হয় মধ্যবিত্ত শিক্ষক কন্যা গৌরী বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভালোবাসিল এবং অবশেষে উহাদের বিবাহ হইল ইহাই গোত্রান্তর। কিন্তু গোত্রান্তরের আর একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজ যে আজ সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা ও শ্রেণি আভিজাত্যের গোত্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া কায়িক পরিশ্রমজীবী শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হইয়া পড়িতেছে ইহাই প্রকৃত গোত্রান্তর।"[৮]

বস্তুত ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত কন্যার এদেশীয় শ্রমজীবী যুবকের স্ত্রীতে গোত্রান্তরের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থাবৈগুণ্যে অস্তিত্বরক্ষার্থে এবং জীবনধারণের লক্ষ্যে শ্রমজীবীতে গোত্রান্তরের ইতিবৃত্ত সুনিপুণ দক্ষতায় বর্ণনা করে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আসন্ন পরিণামস্বরূপ অর্থনৈতিক মন্দা, কলকারখানার মালিক পক্ষ কর্তৃক শ্রমিক শোষণ, বঞ্চনা, ন্যূনতম মজুরি প্রদান, লকআউট ইত্যাদিকে কেন্দ্র অরে শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক মালিক বিরোধ, ধর্মঘট, স্বাধিকারের দাবিতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই তিন গণনাট্যকার নাট্যরচনার ব্রতী হয়েছেন। কমিউনিস্টপন্থী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য দুই নাটক যথাক্রমে 'অবরোধ' এবং 'মোকাবিলা' এপ্রসঙ্গে উল্লখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যাম্ভাবী পরিণামস্বরূপ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, ভারতের অর্থনীতির ওপর সুবিশাল চাপ, শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও শ্রমিক অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'অবরোধ' অবশ্য আলোচিতব্য-নাটক।

> "অবরোধ নাটক শ্রমিকদের জীবন, কারখানার মালিকদের নিয়ে লেখা। অথচ এই নাটক গণনাট্য সংঘ কেন করতে পারলো না? কারণ দুটি। একটি বিজনের কারখানা ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব এবং দ্বিতীয় জনযদ্ধের রাজনীতিতে শ্রমিক আন্দোলন তখন যেভাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল তার মধ্যেকার কৌশলগত রূপকে বুঝতে না পারা বিজন গ্রামের কৃষকদের যত চেনেন, কারখানা পুঁজিবাদ ও শ্রমিককে তত চেনেন না।"[৯]

বস্তুত 'অবরোধ' নাটকে রায়বাহাদুর পুত্র ন্যাশানাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মি. সেনের অপরিমেয় অর্থলিপ্সা, শ্রমিক-শোষণ ও বঞ্চনার দ্বারা মুনাফা অর্জন তাঁর স্বার্থান্ধ, পুঁজিবাদী মানসিকতারই পরিচায়ক। শ্রমিক শ্রেণির প্রতিবাদ, অধিকারের দাবিতে আন্দোলন তার নিকট দরিদ্রের ঔদ্ধত্য রূপে পরিগণিত। সেই সঙ্গে কবিপত্নী সাবিত্রী দেবীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক, নিজ বিবাহিতা পত্নী সুচিত্রা দেবীকে অলংকার প্রদানের বাহুল্যেই স্বামীর কর্তব্য সমাপন, স্ত্রীর মূল্যমান নির্ধারণ ও অর্থের অহমিকা প্রকাশ– তার নৈতিক এবং চারিত্রিক শিথিলতার প্রকাশ লক্ষণীয়। স্ত্রীর ক্রমান্বয়িক সাবধানবাণী উপেক্ষা করে বিদ্রোহী শ্রমিকদের শাস্তিবিধানের লক্ষ্যে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হরণ, কোম্পানির অর্ডার প্রাপ্তির জন্য সাবিত্রী দেবীর নারীত্বকে ব্যবহারের সংকল্প তাকে অধঃপাতের অন্তিম পর্যায়ে অবনমিত করে।

অনুরূপভাবে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' নাটকটিও পুঁজিবাদী অর্থনীতির অঙ্গস্বরূপ শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে এক অসাধু ব্যবসায়ী, কারখানার মালিকের শ্রমিক-শোষণের পটভূমিতে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে কালীনাথের অন্যায়পথে ব্যবসার দ্বারা বিপুল অর্থসঞ্চয় করে বর্তমানে কারখানার মালিক রূপে সামাজিক প্রতিপত্তি প্রাপ্তি, অধিকতর মুনাফার লোভে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চনা, শ্রমিক ছাঁটাই, স্বল্প সংখ্যক শ্রমিকের ওপর বিপুল পরিমাণ কার্যভার অর্পণ, কন্যাসমা কণিকাকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগদানের প্রতিশ্রুতিদানের

বিনিময়ে নিজ বিকৃত বাসনা চরিতার্থের প্রচেষ্টা, নিজ পত্নীকে বহুমূল্য অলংকার প্রদানের দ্বারা স্বামীর কর্তব্য সমাপ্তকরণ এং পরিশেষে স্ত্রীর সাবধানবাণী ও সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্মুখে পরাভব ও শ্রমিকের দাবি পূরণে বাধ্য হওয়ার কাহিনি বর্ণনার দ্বারা নাট্যকার সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্রায়ণের পাশাপাশি সর্বহারার জয় ঘোষণা করেছেন। তাঁর 'অন্তরাল' নাটকটিও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়কে কেন্দ্র করেই রচিত।

সেইসঙ্গে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ জমিদার, জোতদারদের কৃষক নির্যাতন, শোষণের প্রতিবাদস্বরূপ বিজন ভট্টাচার্যের 'কলঙ্ক', 'দেবীগর্জন', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত একাঙ্ক 'বোধন', 'রক্ত রাঙা সিঁথি' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গণনাট্য আন্দোলনের প্রতিভূ রূপে আলোচ্য নাট্যকারদের নাট্যপরিসরের ব্যাপকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য নাটকসমূহ অবশ্য আলোচিতব্য।

বিজন ভট্টাচার্যের 'কলঙ্ক বং তার পরিবর্ধিত রূপ 'দেবীগর্জন' প্রধানত বাঁকুড়ার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের এক দরিদ্র সাঁওতাল কৃষক পরিবারের চার সদস্য প্রধান, গিরি এবং তাদের পুত্র মংলা এবং নববিবাহিতা পুত্রবধূ রত্নার জীবনে জোতদার প্রভঞ্জনের নিষ্ঠুর চক্রান্তে সর্বস্ব হারিয়ে যে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল তার করুণ আলেখ্যর পাশাপাশি সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের পথে নাট্যকাহিনির ইতিবাচক পরিসমাপ্তি ঘটে। অসহায় মানুষগুলির দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে অর্থগৃধ্ন প্রভঞ্জন কর্জধানের সুদ এবং প্রধানের পুত্রের বিবাহ নিমিত্ত কর্জ রূপে কৌশলে জমিজিরেত হরণ করে নিয়ে তাদের চরম সংকটের সম্মুখিন করে। নিরুপায় হয়ে অন্নসংস্থানের নিমিত্ত প্রধান ও গিরির পুরাতন ব্যবসা ঝুরি বুনন, মংলার কয়লা খনির শ্রমিকে পরিণত হওয়া, প্রভঞ্জন সুহৃদ ত্রিভুবনের চক্রান্তে রত্নার প্রভঞ্জনের খামারে কামিনের কাজ করতে গিয়ে প্রভঞ্জনের প্রবৃত্তির শিকার হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার পরবর্তী অধ্যায়ে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক অভ্যুত্থান, ধর্মগোলা উন্মুক্ত হওয়া এবং রত্নার মৃতদেহ উদ্ধার অন্তে মংলা কর্তৃক প্রভঞ্জননিধনের দ্বারা সর্বহারা শ্রেণির জয়ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নাট্যকাহিনির ইতিবাচক পরিণতি ঘটেছে।

অন্যদিকে জমিদার জোতদার কর্তৃক শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাঙ্ক 'বোধন' তেভাগা আন্দোলনে কষ্টোৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশের দাবিতে চাষীদের জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামের রক্তাক্ত কাহিনির পাশাপাশি কৃষক বধূদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ, আত্মত্যাগের মর্মস্পর্শী রূপায়ণ 'বোধন'। জমিদার কর্তৃক অসম লড়াইতে স্বামী আক্রান্ত হলে দুর্গার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প, সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ- বাস্তবিকই ইতিহাসসম্মত।

"তুমার রক্তে যে মাটি রাঙা করলো একবার দেখে নিব তার রক্ত কতখানি।"[১০]

অন্যদিকে তাঁর 'রক্ত রাঙা সিঁথি' একাঙ্কে জমির স্বত্বাধিকারের দাবিতে জোতদারদের বিরুদ্ধে বর্গাচাষীদের সমবেত প্রতিরোধ আন্দোলন, জোতদার কর্তৃক নিষ্ঠুর উপায়ে আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা এমনকি কৃষক কন্যার ওপর নির্বিচারে অত্যাচারের বাস্তবনিষ্ঠ আলেখ্য আলোচ্য নাটকটি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই ত্রয়ী নাট্যকার ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সঙ্ঘের বাণিবাহীরূপে চল্লিশের দশকের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের দুঃসময়কে নাটকের বিষয় রূপে নির্বাচন করে অন্ধকারে নিমজ্জমান জাতিকে উত্তরণের পথ প্রদর্শন করেছেন।

> "বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বিরাট সংকট রাজনীতির ক্ষেত্র জুড়ে প্রকাণ্ড হতাশা সামাজিক জীবনে অতিকায় প্রেতচ্ছায়া- এমনি সময় আত্মপ্রকাশ করলো গণনাট্য সংঘ একদল আশাবাদী তরুন-তরুনীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। বাংলার নাট্যশালা গুলি দর্শকের সত্যিকারের চাহিদা মেটাতে পারছে না; বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন, এই সব সমস্যার সম্মুখীন হই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তায় সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠতে প্রয়াস পেল সে দিক দিয়ে এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক।
>
> এই সংঘের কাজ হল যেমনি একদিকে স্তিমিত প্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা। জনগণের ব্যক্তির মধ্যে টেনে এনে এই গণসংযোগের সম্প্রসারণ এর মধ্যে দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন ভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে মানুষের বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলিয়ান করে তুলতে

সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। তাই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরো ভাগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।"[১১]

বস্তুত গণনাট্যের বিস্তারের ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবনবন্দী', 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'মায়ের দাবি' নাটিকা, 'ছেঁড়া তার', 'দুঃখীর ইমান', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান', 'দীপশিখা', 'বোধন', 'রক্ত রাঙা সিঁথি', 'মোকাবিলা', 'অন্তরাল', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' মন্বন্তর ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণির সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাহিনির উপস্থাপনে গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে।গণনাট্যের এই জনজাগরণের জোয়ারে আলোচ্য ত্রয়ী নাট্যকারের ভূমিকার অনন্যতা তাই অনস্বীকার্য।

বর্তমান আলোচনার সাপেক্ষে বলা চলে, চল্লিশের দশকের উত্তাল, অস্থির, অরাজকতাদীর্ণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানবাত্মাকে মুক্তির দিশার সন্ধান দানে ব্রতী হয়েছেন আলোচ্য ত্রয়ী গণনাট্যকার। মানবতাবাদী, কমিউনিস্টপন্থী, জনদরদী এই তিন নাট্যকারের বলিষ্ঠ লেখনীতে একদিকে যেমন অত্যাচার, পীড়ন, শোষণ, বঞ্চনার কাহিনি ধ্বনিত হয়েছে, পাশাপাশি গণনাট্যকার রূপে মানবাত্মাকে যাবতীয় সংকট থেকে মুক্তি ও উত্তরণের দিশারও সন্ধান দিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকের বাংলার এক অধ্যায় স্বরূপ বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বাংলার নাট্যইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তা বলাইবাহুল্য।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র, ত্রি-নাট্যম, কলকাতা, নবগ্রন্থ কুটির, ১৩৯৭, পৃ. ৯
২. ভারতকোষ (চতুর্থখণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭০, পৃ. ৭৫
৩. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (চতুর্থ খণ্ড), উইলিয়ম বেণ্টন পাবলিশার্স, চিকাগো, ১৯৭৪, পৃ. ৪৬
৪. শীলস, ডেভিড এল, (সম্পাদিত) ইণ্টারন্যাশানাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ দি সোশ্যাল সাইন্সেস (৫ ম খণ্ড), দি ম্যাক্মিলান কোম্পানি, নিউ ইউর্ক, ১৯৭২, পৃ. ৩২২
৫. যুগান্তর, ২৫ শে চৈত্র, ১৩৫০, পৃ. ২
৬. ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, ২য় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৩৯৩
৭. তদেব, পৃ. ৩৮৯
৮. তদেব, পৃ. ৩৭৮
৯. সুধীপ্রধান, গণনাট্য ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, গ্রুপ থিয়েটার, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শারদীয়া, ৮৫, পৃ. ৩৮০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র, একাঙ্ক বিচিত্রা, কলকাতা, মনীষা, ১৯৮৬, পৃ. ১০
১১. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ,১৯৮২, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ১৪২